উড়িয়ে ধ্বজা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে/ ওই যে তিনি ওই যে বাহির পথে।’ মেঘচুম্বী রথে ধ্বজা উড়িয়ে ফিরে আসা মানুষটি যে-ধ্বজাকে অতি সংগোপনে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমেরিকায়, অসংখ্য মতের ভিড়ে-ঠাসা আকাশে তাকে তুলে ধরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে-সুযোগ যখন এল তখন জগতের ধর্মাকাশে ওই একটিই পতাকা উজ্জ্বলতায় ব্যাপ্ত হয়ে রইল। কিন্তু এক ম্লেচ্ছদেশে তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ কী? সেটি কি শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে-দেখা ‘সাদা-সাদা মানুষ’দের নতুন দিশা দেখানোর জন্য? তাহলে তো তিনি সে-পতাকা কাঁধে মিছিল করে চলে যেতেন তাঁর সপ্তর্ষিমণ্ডলে। কিন্তু তা তিনি করেননি। নিজের শিকড়ে দৃঢ় থেকে তাঁর ডালপালা মেলেছিলেন বিশ্বব্যাপী। সে-শিকড় তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল তাঁর মাতৃভূমিতে। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের সমতা থেকে ‘শক্তির ছোট-বড়’র আঙিনায়। তবে তখন সে-বড়র শক্তির প্রকাশ ছিল দুর্বলের ওপর অত্যাচারে, শোষণপ্রক্রিয়ার নব নব রূপ উদ্ভাবনে ও সম্পদবাহুল্যের আস্ফালনে। আর এ-উপলব্ধি স্বামীজীর ঘটেছিল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পরিব্রাজনে—শোষিত থেকে শোষক, ব্রাত্য থেকে স্বঘোষিত উচ্চতায় অহংকারী মানুষের সংস্পর্শে এসে। এই উপলব্ধিটুকুর জন্যই এ-চ্যুতগরিমার ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন তাঁর অচ্যুত পদস্পর্শ দিয়ে। আকাঙ্ক্ষা ছিল একটিই—তাঁর মাতৃভূমির গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

প্রতিটি ফিরে আসার পূর্বে থাকে যাওয়ার প্রক্রিয়া। যাওয়াটি না বুঝলে ফেরার তাৎপর্য বোঝা যায় না। সাধনার পথটিকে সম্যক লক্ষ না করলে সিদ্ধ অবস্থা বোঝা যায় না, কারণ সাধনা সবসময়েই সিদ্ধ অবস্থার আরোপ। আধো উচ্চারণে বীরেশ্বর থেকে বিলে হয়ে নরেন্দ্রনাথ, আবার নরেন্দ্রনাথ থেকে সচ্চিদানন্দ-বিবিদিষানন্দ হয়ে বিবেকানন্দ হয়ে ওঠা, এবং সেখানেই শেষ না হয়ে শুধুমাত্র স্বামীজী নামে জগৎ আলোকিত করা—এটি বোঝার চেষ্টা না করলে তাঁর আমেরিকাতে অতুল সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে ভারতে ফেরার সঠিক কারণ আমরা বুঝতে পারব না।

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় এক অভাবনীয় টানাপোড়েনে দীর্ণ। একদিকে মা-ভাইদের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও প্রায়ই মেটে না, আর অপরদিকে এক অভিনব বাণী প্রচারের আহ্বান অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হচ্ছে। বাগবাজার থেকে

১৮৮৯ সালের ৪ জুলাই প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন, ''ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট; বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা ও দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে।... ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়।... সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে... তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় লইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।... আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকলপ্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়—For 'we have taken up the cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.'—Imitation of Christ"। সমাধিবান সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর 'জগত মিথ্যা' বোধে আস্থা ছিল না, মা-ভাইদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে তবেই বেরিয়ে পড়ার কথা ভেবেছেন। প্রমদাবাবু কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ভুবনেশ্বরী দেবীর আত্মসম্মানে লাগায় তা নিতে অস্বীকার করেন।

যে-ক্রস শ্রীরামকৃষ্ণ বহন করতে দিয়েছেন, যার ভার অনুভব করছেন সর্বদা, তাকে যথাস্থানে প্রোথিত করার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল বরানগর মঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঠাকুর বলেছিলেন, ''চারখুঁট ঘুরে আয় কোথাও কিছু নেই, এবারে সব এইখানে।" কিন্তু সেই ভাবে দৃঢ় করতে ঠাকুর তাঁকে আঘাতের পর আঘাত সইয়েছেন। গাজিপুরে পওহারি বাবার কাছে নতুন কিছু পেতে পারেন এ-ধারণা ভ্রান্ত হলে প্রমদাবাবুকে লিখলেন (৩ মার্চ ১৮৯০), ''আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে... এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, 'নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ'...।"

এই নিশ্চিত বুদ্ধির পরই একটি শক্তি তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। যে-শক্তি ঠাকুর তাঁকে দিয়ে 'ফকির' হয়েছিলেন, আর যে-সিদ্ধান্তে বুঝেছিলেন 'রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া... বদ্ধ-জীবনের জন্য', সেই বৃত্তিই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। সমগ্র ভারত ঘুরে দেখলেন শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য ভাবের প্রাবল্যে পুরনো সংস্কৃতির সব কিছু ভেঙেচুরে দিতে চাইছে, আর একদিকে সাধারণ মানুষ অপরিসীম দারিদ্র্য ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন হয়ে পশুবৎ জীবনযাপন করছে। লিখছেন (২২ আগস্ট ১৮৯২), ''হায় বেচারারা! দুষ্ট চতুর পুরুতরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশপুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাঁদের বাঁচান!" কিন্তু যে-দেশ স্বাধীন চিন্তা ও তার সিদ্ধান্তে এত উন্নত ছিল তার এই দুরবস্থা কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী দেখালেন যে (পণ্ডিত শঙ্করলালকে লেখা চিঠি, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২) : ''পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে

ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা বা দূরভ্রমণ করিবার লোক ছিল বটে, তবে তাহারা প্রায় সবাই ছিল বণিক; পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্যবেক্ষণ দোষযুক্ত ছিল... সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশ যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।"

সমাজে দরিদ্র ও নীচজাতির ওপর অত্যাচারের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে তিনি হতবাক। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ভাঙ্গির গলায় ঘণ্টা তার উপস্থিতি থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে চোখাচোখি হলে তার শাস্তি অনিবার্য, অথচ কোনও পাদরির কাছে খ্রিস্টান হয়ে একটা জামা পরতে পেলে সে আর ভাঙ্গি থাকে না। জয়পুরে আবু পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হলে স্বামীজী তাঁকে বললেন, ''হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!''[১] সেই সময় অনেক মহানুভব মানুষের মধ্যেই নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের জন্যে দুঃখবোধ ছিল এবং তাঁরাও যথাসাধ্য তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু স্বামীজীর তুলনায় তা সামান্যই। তাঁদের দুঃখমোচনের চেষ্টা ছিল অভাবীর প্রতি করুণায়, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধে নয়। স্বামীজীর হৃদয়ে এই বেদনা বহনের ভার যে কতখানি ছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর বিশ্বজয়ের রাতে—যেদিন তাঁর আমেরিকা আসার উদ্দেশ্য সফলতার মুখ দেখেছে। সেদিন আনন্দের পরিবর্তে তাঁর দুঃখ কত তীব্র তা স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে : ''সে রাত্রে শিকাগোর এক ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যত্নাদির অধিকারী হইয়াও তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না।... শয্যায় শয়ন করিবা মাত্র ভারতের দারিদ্র্য এবং এই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে ভয়াবহ বিরোধ যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিল;... অবশেষে ভাবাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূশয্যা গ্রহণপূর্বক কাঁদিয়া বলিলেন, 'মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সেকালে মানযশের আকাঙ্ক্ষা কে করে?... ভারতের জনতাকে কে উঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে? মা দেখিয়ে দাও, আমি কি করে তাদের সেবা করতে পারি।' ''[২]

অন্তরে এই সেবার তীব্র তাগিদ, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষিত বিশাল বটগাছ হয়ে ভারতের সব আর্ত, পীড়িত, দরিদ্র মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠার তাগিদ তাঁকে ফিরিয়ে আনল এ-ভারতে। যাকে ভালবাসতেন, আর যাকে প্রাচুর্যের বিদেশবাসে পবিত্রতার পূণ্যভূমি বলে—এমনকী যার প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত পবিত্র বলে মনে হয়েছিল, সে-ভূমিতে ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের দুই মহাসাগরের উত্থিত ঢেউ যেন মিলিত হয়ে এসে আছড়ে পড়ল দক্ষিণ ভারতের উপকূলে, আর তার উত্তাল তরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে গেল কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত। জাতি হিসেবে বহুকাল কোনও গর্বের বস্তু নিয়ে গলা মেলানো থেকে বঞ্চিত জাতি সমস্বরে জয়গান গাইতে লাগল।

মহাভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, সর্বভাবে বিচ্ছিন্ন, জাতি

হিসাবে নিজেদের সম্পর্কে অজ্ঞ জাতিটির যেন হঠাৎ সমূহচেতনার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। স্বামীজীর উদ্দিষ্ট কর্মের অর্ধাংশ এতেই সমাধা হয়ে গেল। আলাসিঙ্গাকে লিখলেন (২৮ মে ১৮৯৪), ''হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর। মনে রাখিও 'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্তহস্তীকেও বাঁধা যায়।... জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।... ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী।''

সেই সর্বগ্রাসী স্রোত শুরু হল কলম্বো থেকে। তাঁর কথা শোনবার জন্য সকলে পাগল। দিন নেই রাত নেই বক্তৃতা, ঘরোয়া আসর, কথোপকথন। আহার-নিদ্রা জলাঞ্জলি দিয়ে দীর্ঘকাল পরে ফিরলেন, তাঁর জন্মভূমি কলকাতায়। কিন্তু ততদিনে তাঁর শরীর চূর্ণ হয়ে গেছে। মিসেস বুলকে লিখলেন (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭), ''লোকে যেমন বলে, 'আমার মরবারও সময় নেই', সমগ্র দেশময় শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড ও সংবর্ধনার রকমারি আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায়।... আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে ছ-মাসও বাঁচব কি না সন্দেহ!''

নেতা বলতে আমরা রাজনৈতিক নেতা বুঝি, অবশ্য ধর্মীয় নেতা যে আমাদের অপরিচিত তাও নয়। বস্তুত বিষয় অনুসারে আমরা নেতাদের ভাগ করে থাকি। কিন্তু নেতা তিনিই যিনি সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন, আর তা পারেন তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলেই। মহাত্মা গান্ধির মধ্যে আমরা সেই ভাবের কিছুটা পাই, তবে তার প্রকাশ মূলত রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু যথার্থ নেতা অর্থাৎ সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারীর ভাব অত্যন্ত গভীর হয়ে থাকে, আর সে-গভীরতার তারতম্যের উপরেই তাঁর প্রভাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। স্বামীজী ভাইদের চিঠিতে লিখেছিলেন (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪), ''কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।/ কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥'' পবননন্দনের মতো দাস্যভক্তি ছিল বলেই পর্বতপ্রমাণ জড়ত্বকে টলিয়ে দেওয়ার মতো অসম্ভব কার্য সমাধা হয়েছিল। শতচ্ছিন্ন কাপড়ে আচ্ছাদিত যে-দরিদ্রের চোখে হতাশার গভীর কালিমা দেখেছিলেন তাদের চোখেই এখন আশার বিদ্যুৎ লক্ষ করলেন। জাতি হিসেবে উঠতে গেলে বৃহত্তর অবহেলিত জনসমাজকে তুলতে হবে প্রথমে। সর্বাগ্রে চাই মানবধর্মে দীক্ষা। যে-দীক্ষা কাম ও অর্থে পরিমিতিবোধ আনবে। ঠাকুর যাকে বলেছিলেন 'মানুষ মানে মান-হুঁশ'। সেই হুঁশ ফেরাতে স্বামীজী বললেন, অন্তরে যে-পূর্ণতা বর্তমান তার প্রকাশ ঘটানোই শিক্ষা, আর অন্তরে যে-দেবত্ব বর্তমান তার বিকাশ ঘটানোই ধর্মের কাজ, মোক্ষ তার অনেক পরে। সেই মর্মে শুরু হল কাজ। ত্যাগী যুবকদের নিয়ে তৈরি হল সঙ্ঘ, সঙ্গে অনুগামী গৃহীর দল। স্বামীজী বললেন, এটি মানুষ তৈরির বিশ্ববিদ্যালয়, কারণ সেটিই প্রাক্‌শর্ত মোক্ষপথে চলার। যেহেতু সেখানে শ্যামা মায়ের ঘুড়ির খেলায় 'লক্ষের দুটো একটা কাটে' তাই বাকি যারা, তারা মান-হুঁশ হয়ে এ-জগতকে আলো দেখাবে আত্মোন্নতির, আনন্দের, শান্তির। বললেন, ''তোদের তো এত ভালবাসি, তবু তোরা পরের জন্যে খেটে খেটে মরে যা, আমি দেখে শান্তি পাই।'' তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, নিজের জন্য খেটে খেটেই মানুষ মরে, পরের জন্য মরলে সে অমর হয়, আর এখন এটাই পথ।

স্বামীজী তাঁর কর্মপদ্ধতি বিস্তার করে বলেছিলেন মাদ্রাজে 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায়। এই বক্তৃতাটি আমাদের উন্নতির পথের একটি দলিল, যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজী বলেছিলেন, ''আমি যখন ফিরে আসব, এই সমাজের ওপর বোমার মতো ফেটে পড়ব আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।''[৩] কুকুর শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়নি, তার একনিষ্ঠ অনুসরণ ক্ষমতাকে লক্ষ করে এটি বলা। একথাটির অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, আমরা তাঁর পথ অনুসরণ করতে বাধ্য, সেটি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই হোক। তখন ধর্মীয় সংস্কারের জোয়ার বইছে। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, দয়ানন্দ স্বামীর আর্যসমাজ এবং শশধর পণ্ডিতের মতো প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। যে-সমাজ বেদান্তের মতো অত্যুচ্চ দর্শনের জন্ম দিয়েছিল সে-সমাজ কোথায়! অতি দরিদ্র, প্রবলভাবে অত্যাচারিত, দুর্দশাগ্রস্ত বিশাল জনসমাজ এই সংস্কারের জন্য প্রস্তুত কী না তা দেখার কেউ নেই। পাশ্চাত্যের ভাবনার অনুকরণে আমাদের সংস্কারস্পৃহা যে কত তুচ্ছ, অবশ্যম্ভাবী বিফলতায় ভরা, তা স্বামীজী ভিন্ন এমনভাবে কেউ আমাদের বলেননি। আমাদের দেশের গভীর অসুখের কথা এমনভাবে কেউ অনুধাবন করেননি, আবার সে-অসুখের ওষুধ সম্পর্কেও এইভাবে কেউ ভাবেননি। পুরনো অসুখ সারতে সময় লাগে, কিন্তু তার চিকিৎসার আগে রোগীকে তো বুঝতে হবে যে তার চিকিৎসার দরকার! সমাজের দোষের সংস্কার প্রয়োজন ভাল কথা, কিন্তু স্বামীজী প্রশ্ন তুললেন, সংস্কারপ্রার্থী কই! যাদের জন্য সংস্কার তারা কি সংস্কৃত হতে প্রস্তুত? বললেন, ''আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।'' স্বামীজীর দেশপ্রেমের বীজ এইখানে। তখন দেশপ্রেমের জোয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। স্বামীজী তার প্রয়োজন অনুভব করলেও জানতেন যে, সেই স্বাধীন বোধসম্পন্ন মানুষ নেই যারা স্বাধীনতা বজায় রাখবে। সমাজকে হিন্দুধর্মের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে প্রয়োজন সেই জ্ঞানোন্মেষ, যার দ্বারা সংস্কার সমাজের মধ্য থেকেই আসবে। তাই দরকার প্রকৃত শিক্ষা যা পেলে সংস্কার আপনি ঘটবে, কোনও আন্দোলন ছাড়াই, আর তার নামই আমূল সংস্কার। পাশ্চাত্য দর্শন তার ভাবনা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয় ও তাদের মতো করে ভাবতে শেখায়, আর প্রাচ্য দর্শন সমাজকে 'হয়ে' উঠতে শেখায় তার নিজ নিজ ভাব অনুসারে। কিন্তু সে-দর্শন মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত এবং তারা তাদের বিশেষ অধিকারটি দিয়ে বৃহত্তর সমাজকে আত্মশক্তিহীন, নিজেদের মুখাপেক্ষী ও কপর্দকহীন দরিদ্র করে রেখেছে। তার জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা—গণশিক্ষার আকারে।

তাই আন্দোলন চাই, তবে তা জনগণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য, সংস্কারের জন্য নয়। কিন্তু এই আন্দোলনের হোতা কারা হবে? স্বামীজী বললেন, ''মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে, বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।'' (১৯ মার্চ ১৮৯৪)। অতএব তারাই করবে, তবে সংস্কারের ভাবনায় নয়, শিবজ্ঞানে সেবার মাধ্যমে। যে-সেবা তাদের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বেদান্তবোধের ভিত্তি দৃঢ় করবে। এই যুগান্তকারী মৌলিক ভাবনা নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামীজী হয়ে ওঠার ফল। কাশীপুরে যার শুরু, পাশ্চাত্য জয় করে তার শেষ। কাশীপুরে সূত্রাকারে ঠাকুরের কাছ

থেকে যে-ভাব পেয়েছিলেন, যাতে সমগ্র জগতের কল্যাণের বীজ প্রোথিত ছিল, সেই ভাবটি পুষ্টিলাভ করেছিল প্রথমে ভারত ও তারপর পাশ্চাত্য পরিব্রাজনে। ভারতের গভীর আধ্যাত্মিকতাকে প্রেক্ষাপটে রেখে জাতির কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও পশুবৎ চরম দুর্দশা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে পাশ্চাত্যে গেলেন স্বামীজী। সেখানে বাহ্যবৈভব, আত্মশক্তিতে ভরপুর অধিবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ কাজ ও সামাজিক শৃঙ্খলা তাঁকে মুগ্ধ করলেও দেখলেন আধ্যাত্মিকতায় তাদের চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশা। এ-দুটির বিনিময় ঘটলে দুপক্ষেরই উন্নতি। ভিক্ষাপাত্রে করুণার দানের সঙ্গে তাচ্ছিল্য মিশে থাকে। তাই ভিক্ষা নয়, আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাদের বাহ্য উন্নতির জ্ঞান যা তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের দেবে গুরুদক্ষিণা হিসাবে—সেই প্রচেষ্টার এক নতুন দিক উন্মোচিত হল। স্বামীজী বুঝলেন ভারতের বাণী জগতকে শোনাতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তি প্রচারকারীর মাধ্যমে সে-দেশে ছড়িয়ে পড়লে তা ফলপ্রসূ হবে। তাই দেশে ফিরেই শুরু হল সঙ্ঘ তৈরির কাজ।

কিন্তু এদেশে সঙ্ঘ যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে নিয়োজিত হবে সেটি কোন ভাব? শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ্য ভাব আমরা যা পাই তা হল—ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং সমস্ত ধর্মই সত্য কারণ মত পথ মাত্র, যা ব্যাকুল সাধককে সেই একই সত্যে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এদেশের হতদরিদ্র, অভুক্ত মানুষের কাছে এই প্রচার হাস্যকর! শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। অতএব দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে শোনা সেই সূত্র যা বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারে তার প্রয়োগ দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ''জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'' কথাটি শুনে উপস্থিত কেউ তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু স্বামীজী সেটি শুনেই কথাটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ভগবান দিন দিলে তা সর্বত্র প্রচার করবেন। সেটিকে এবারে সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য করে তুললেন। মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে রেখে নীতিবাক্য তৈরি করলেন —'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এও এক অশ্রুতপূর্ব মৌলিক ভাবনা। মুক্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গে জগতের হিতকর্ম যুক্ত হল। অদ্বৈত বেদান্তমতে কর্মের ন্যূনতা এখানেই যে, সে সরাসরি জ্ঞানে পৌঁছে দিতে পারে না যা কর্মত্যাগ করে জ্ঞানচর্চায় পাওয়া সম্ভব। কর্ম বড়জোর চিত্তশুদ্ধি দিতে পারে, তারপর সেই শুদ্ধ চিত্তে নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন দিশা দিলেন, বললেন, ''শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা—একই জিনিস।''[৪] মন বাসনাশূন্য হলে সেখানে আত্মাই প্রতিভাত হয়। আবার এটি প্রচলিত কর্মযোগ অনুসারে কর্ম করে তার ফল সমর্পণ নয়, কারণ এটি ঈশ্বরবোধে তাঁরই প্রীত্যর্থে সেবা, যেখানে

অজ্ঞ, দরিদ্র, অসুস্থ মানুষের কল্যাণ বই অন্য কামনা নেই। অপরের কল্যাণকামনা ভক্তিকামনার মতো, যাতে কামনার বন্ধন নেই। কর্মযোগের এ এক নতুন ভাব যা আত্মার ব্যাপ্তি ঘটায়, বেদান্তসিদ্ধান্তকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।

কিন্তু জনগণের অর্ধাংশ নারী। পুরুষের যতটুকু শিক্ষার সুযোগ আছে তাদের সেটুকুও নেই। জাতি হিসাবে উঠে দাঁড়াতে গেলে এক পায়ে কি দাঁড়ানো সম্ভব? দুটি পাখা সমান সবল না হলে পাখির ওড়া ছন্দোময় হয় না। দুটি পা সবল না হলে চলন সতেজ হয় না। তাই স্বামীজী বললেন, আগে মেয়েদের সঙ্ঘ গড়তে হবে। কিন্তু মেয়েদের সেই পর্দানশীনতার যুগে এ-ভাবনা তখন সুদূর কল্পনা শুধু নয়, পুরোপুরি অবাস্তব। তাই তাদের সামনে এক আদর্শ নারীর দরকার। শ্রীশ্রীমা রয়েছেন, তাঁকে ঘিরেই সঙ্ঘ গড়তে হবে কিন্তু তাঁর সত্ত্বগুণের শরীর স্নেহবাৎসল্যে ঢাকা। পুরুষসিংহ স্বামীজীর মতো নারীকল্যাণের জন্যও এক সিংহিনী প্রয়োজন। স্বামীজী তুলে আনলেন নিবেদিতাকে, যাঁর মধ্যে সত্যপ্রিয়তা, প্রবল যুক্তিবোধ, ক্ষাত্রবীর্যের প্রকাশ ও সেই সঙ্গে তীব্র মানবপ্রেমের সম্ভাবনা স্বামীজীর ছায়া হয়ে বিরাজ করছে। গড়ে তুললেন তাঁকে প্রাচীন ভারতীয় নারীর মর্যাদায়। এই শিক্ষার বলে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনেই তাঁর মহত্ত্ব গভীরভাবে অনুভব করলেন নিবেদিতা। বুঝলেন মা শ্রীরামকৃষ্ণের 'বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র', যিনি প্রাচীন নারীর শেষ প্রতিনিধি ও আগামী দিনে নারীকে যা হয়ে উঠতে হবে তার অগ্রদূত। শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভক্তদের একসঙ্গে রাখার প্রচেষ্টা সাংগঠনিক রূপ নিয়েছিল তাঁর শরীরত্যাগের এগারো বছর পরে। একেবারে অসংগঠিত নারীসমাজের মধ্যে এক ত্যাগী নারীসঙ্ঘ গঠনের ভাবনা রূপ পেতে অর্ধশতাব্দী লেগে যাওয়া কিছুই নয়। স্বামীজীর ভাবদর্শনে যে-আধ্যাত্মিক প্রবাহ দেড় হাজার বছর চলবে তার তুলনায় কতটুকু! স্বামীজী নারীর সে-প্রতিষ্ঠিত সংগঠন দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু নিবেদিতার হাত দিয়ে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ে তার বীজটি পুঁতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী শুধু সঙ্ঘ গড়েই ক্ষান্ত হননি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের সূক্ষ্মদেহকে সঙ্ঘে আবাহন করে সঙ্ঘদুটিকে তাঁদের স্থূলশরীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। না—এ কোনও কাব্যিক উপস্থাপনা নয়। এ-দুটি সঙ্ঘভুক্ত সকলেই জানেন যে, সঙ্ঘদুটির পত্রপল্লবে বেড়ে ওঠার রসদ কোথা থেকে আসছে।

স্বামীজীর প্রত্যাগমনের একশো পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হল। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন কেবল সাল-তারিখ দিয়ে পালনের উৎসব মাত্র নয়। কারণ এই ঘটনা আমাদের তাঁর প্রত্যাগমনের অভিঘাতকে মনে করিয়ে দেয়। সে-অভিঘাত তাঁরই ভাষায় : ''আমি বোমার মতো ফেটে পড়ব।'' ফেটে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে আণবিক বোমার মতো। শুধু সে-বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মারণশক্তি ছিল না, ছিল জীবনদায়ী শক্তি। সে-তেজস্ক্রিয়তার অলক্ষ্য শক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজকে প্রখর ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন সারমেয়র মতো মুক্ত এক নতুন জীবনের সুগন্ধের অনুসরণ করাচ্ছে, করাবেও আগামী বহু শতাব্দী ধরে। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪০

২। তদেব, খণ্ড ২ (২০০১), পৃঃ ২৭

৩। দ্রঃ Swami Nikhilananda, *Vivekananda —A Biography* (Advaita Ashrama: Kolkata, 2010) [Chapter: As a Wandering Monk]

৪। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১) অখণ্ড, পৃঃ ৫০৬